খাঁটি মুমিন হতে হলে
তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে

অধ্যাপক গোলাম আযম

এ বইটি জরুরি কেন

সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে হলে প্রথমে তাগূতের কাফির হওয়া দরকার। তাগূতকে অস্বীকার না করে ঈমান আনলে পদে পদে তাগূতের চাপে পড়ে ঈমানের দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হতে হয়।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে বান্দার যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তা মযবুত না হলে তাগূতের দাপটে ঐ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ঈমানকে মযবুত করার উদ্দেশ্যেই তাগূতকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

এ কারণেই তাগূতকে চিনতে হবে। না চিনলে কেমন করে তাকে অস্বীকার বা অমান্য করবে? তাই তাগূত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

দুঃখের বিষয় যে, বাংলা ভাষায় কুরআন মাজীদের যত অনুবাদ আমার চোখে পড়েছে তাতে তাগূতের অর্থ মোটেই স্পষ্ট বোঝা যায় না। কয়েকটি অনুবাদে 'তাগূত' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে, এর বাংলা অনুবাদ লেখা নেই। কয়েকটি অনুবাদে এর অর্থ লেখা হয়েছে শয়তান, কোনো অনুবাদে 'আল্লাহবিরোধী শক্তি' লেখা আছে। এসব অনুবাদ থেকে কোনো স্পষ্ট ধারণা হয় না।

আমি তীব্রভাবে অনুভব করেছি যে, বাংলাভাষী ঈমানদারদের নিকট তাগূতের অর্থ স্পষ্ট হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

এ বিরাট প্রয়োজনের মহান উদ্দেশ্যেই বইটি লিখলাম। আল্লাহ তাআলার দরবারে আকুল আবেদন জানাই, যাতে এ বইটি যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তাদের নিকট অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে।

গোলাম আযম
লন্ডন, আগস্ট ২০০৬

www.priyoboi.com

সূচিপত্র

খাঁটি মুমিন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে
তাগূতের পরিচয় কী?
কারা তাগূতী শক্তি?
নাফস ও শয়তান
সামাজিক কুপ্রথা
শাসনশক্তি
রিয্ক বন্ধ করে দেওয়ার ভয় দেখানোর শক্তি
অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তি
'উরওয়াতুল উসকা' মানে কী?
আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্কের ধরন
রব হিসেবে সম্পর্ক
বাদশাহ হিসেবে সম্পর্ক
তিনি আমার ইলাহ
তাগূতের হুকুম মানলে এসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়
কালেমায়ে তাইয়েবার বক্তব্য কী?
তাগূতকে না চেনার পরিণাম

www.priyoboi.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

খাঁটি মুমিন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে

অধ্যাপক গোলাম আযম

সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَانْفِصَامَ لَهَا ـ

অর্থাৎ, যে 'তাগূত'-এর প্রতি কুফরী করেছে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন মযবুত রশি ধরেছে, যা কখনো ছিঁড়বে না।

কুরআন মাজীদে আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম গুণাবলি উল্লেখ করার পর এ আয়াতে তিনি বলেছেন, আল্লাহর যে পরিচয় আয়াতুল কুরসীতে দেওয়া হলো তাঁর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনতে হলে একটা শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্তটি হলো 'তাগূতের কাফির হওয়া'। প্রথমে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে। তারপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে সত্যিকার খাঁটি মুমিন হওয়া সম্ভব। তাগূতকে মানতে অস্বীকার না করে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাদের ঈমান মোটেই মযবুত নয়। কারণ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে বান্দাহর যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা তাগূতের দাপটে ছিন্ন হয়ে যায়। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগেই তাগূতকে না মানার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তাগূতের পরিচয় কী?

কুরআনের কোনো কোনো বাংলা অনুবাদে 'তাগূত' অর্থ দেখেছি 'শয়তান'। শয়তান অবশ্যই একটি তাগূত। কিন্তু তাগূত শব্দের অর্থ শয়তান নয়। তাগূত শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা জানা অত্যন্ত জরুরি। যদি তাগূত সম্পর্কে সঠিক ধারণাই না থাকে তাহলে এর প্রতি কুফরী করা কেমন করে সম্ভব হবে? কুফরী করার অর্থ মানতে অস্বীকার করা। কারা কারা তাগূত তা জানা না থাকলে কীভাবে মানতে অস্বীকার করবে? طَاغُوْت (তাগূত) আরবী শব্দ। এর বাংলা অনুবাদ হলো সীমা লঙ্ঘনকারী। طَغٰى মানে সীমা লঙ্ঘন করেছে। ফিরাউন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে 'ইন্নাহূ তাগা' অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাই সীমা লঙ্ঘন করা বলতে কী বোঝায়, তা জানতে হবে।

আল্লাহ তাআলা কতক কাজ করতে আদেশ করেছেন, আর কতক কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মানুষকে আদেশ পালন করতে যেমন বাধ্য করেন না, তেমনি নিষিদ্ধ কাজ থেকে ফিরে থাকতেও বাধ্য করেন না। তিনি মানুষকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ইখতিয়ার বা ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহর নাফরমানি করার এ ক্ষমতার দুটো সীমা তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। একটা প্রাথমিক সীমা, অপরটি চূড়ান্ত সীমা।

প্রাথমিক সীমা হলো ফিস্‌ক (فِسْقٌ)। আর চূড়ান্ত সীমা হলো কুফর (كُفْرٌ)। ফিস্‌ক মানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা। আর কুফর হলো হুকুমকে অস্বীকার করা। যে নামায আদায় করা আল্লাহর হুকুম বলে স্বীকার করে; কিন্তু নামায পড়ে না, সে কাফির নয়; বরং ফাসিক। যে আল্লাহর হুকুমকেই অস্বীকার করে, সে কাফির।

যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার এ দুটো সীমা লঙ্ঘন করে, সে হলো তাগূত। ঐ সীমা কীভাবে লঙ্ঘন করা হয়, তা বুঝতে পারলেই তাগূতকে চেনা যাবে।

যেমন– কয়েকজন মুসলমান যুবক বন্ধু তাস খেলছে। আযান শুনে তাদের একজন 'নামাযে যাই' বলে উঠে গেল। আর সবাই বলে উঠল, আরে বস্‌, খেলাটা নষ্ট করিস্‌ না। এ বয়সেই মোল্লা হয়ে গেলি? যারা তাকে নামাযে যেতে বাধা দিল তারা নামাযকে অস্বীকার না করলেও নিজেরা নামাযে গেল না। তাই তারা ফাসিক। তারা নিজেরা ফাসিক হতে পারে, এর ইখতিয়ার তাদের আছে; কিন্তু আল্লাহর এক বান্দাহকে নামায থেকে ফিরিয়ে রাখার কোনো ইখতিয়ার তাদের নেই। তাদের এ কাজটি ফিস্‌ক্‌-এর সীমা লঙ্ঘন। নিজে ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু অন্যকে ফাসিক বানানোর অধিকার নেই।

www.priyoboi.com

তেমনিভাবে যে কাফের তার কুফরী করার ইখতিয়ার আছে বটে, কিন্তু যদি সে অন্য লোককে ঈমান আনতে বাধা দেয়, ঈমানদারকে কুফরী করতে বাধ্য করে বা চেষ্টা করে তাহলে সে কুফরীর সীমাও লঙ্ঘন করল।

আল্লাহ বলতে চান, দেখ্ তোকে আমি এ স্বাধীনতা দিয়েছি যে, ইচ্ছা করলে ফাসিক হবি বা কাফির হবি। আমার অবাধ্য হওয়ার সীমা এটুকুই। তোকে পৃথিবীতে একাই পাঠিয়েছি। একাই আমার কাছে ফিরে আসবি। তোর বিচারও আলাদাভাবেই করা হবে। আমার দেওয়া শাস্তিও তোকে একাই ভোগ করতে হবে। কিন্তু অন্য কাউকে আমার অবাধ্য বানানোর চেষ্টা করার কোনো ইখতিয়ার তোকে দিইনি। আমার অবাধ্যতার সীমাও তুই লঙ্ঘন করলি।

যেসব শক্তি প্ররোচনা দিয়ে, ধোঁকা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মানুষকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে চেষ্টা করে তারাই তাগূত। তারা মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য বানিয়ে তাদের হুকুমের গোলাম বানাতে চায়।

কারা তাগূতী শক্তি?

তাগূতের সংজ্ঞা জানা গেল। কোন্ কোন্ শক্তিকে তাগূত বলা যায় তা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে কেমন করে তাগূতকে মানতে অস্বীকার করা যাবে? এটা অত্যন্ত জরুরি। তাগূতের কুফরী করতে হলে তাগূতকে ঠিকভাবে চিনতে হবে।

কুরআন থেকে কয়েক রকমের তাগূতকে চেনা যায়। এসবকে ভালোভাবে চিনতে পারলেই তাগূতকে অমান্য করা সম্ভব। পাঁচ রকমের শক্তিকে তাগূত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যথা–

১. নাফস ও শয়তান; ২. ইসলামবিরোধী প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি; ৩. শাসনশক্তি; ৪. রিয্ক বন্ধ করার ভয় দেখানোর শক্তি; ৫. অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তি।

১. নাফস ও শয়তান

মানবদেহটি আসল মানুষ নয়। কুরআনের ভাষায় 'রূহ' হলো আসল মানুষ। এটা নৈতিক সত্তা বা বিবেক। কোন্টা ভালো আর কোন্টা মন্দ, তা বোঝার শক্তিকেই মানুষ বলা হয়। এটা বস্তু নয়। এর অস্তিত্ব সব মানুষই অনুভব করে।

দেহ বস্তু দিয়ে তৈরি। অন্যান্য পশুর যেমন বিবেকশক্তি নেই, দেহেরও নৈতিক চেতনা নেই। বস্তুজগতের প্রতি দেহের প্রবল আকর্ষণ। এটাই স্বাভাবিক। দেহের যাবতীয় দাবিকে একসাথে নাফস বলা হয়। বাংলায় একে প্রবৃত্তি বলা যায়। সকল মানুষেরই এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে, প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ এমন কিছু করে ফেলে, যা বিবেক সমর্থন করে না। করার পর বিবেক দংশন করে। মানুষের মধ্যে এ দুটো সত্তাই রয়েছে। একটি বস্তুসত্তা, অপরটি নৈতিক সত্তা।

নাফসের যেহেতু নৈতিক চেতনা নেই, তাই যা করা নৈতিক দিক দিয়ে উচিত নয়, তা করার জন্য সে দাবি জানায়। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য নাফস তাড়না দেয়। তাই নাফস বা প্রবৃত্তিই হলো এক নম্বর তাগূত। নাফসের হুকুম অমান্য করার সিদ্ধান্ত ছাড়া আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা অর্থহীন। কারণ, নাফসকে অমান্য করা ঈমানের দাবি বলে না জানলে ঈমান আনা সত্ত্বেও নাফসের গোলামি চলতে থাকবে। এ ঈমানের কোনো মূল্য নেই।

সূরা নাযি'আতের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى ـ

অর্থাৎ, "আর যে (আখিরাতে) নিজের রবের সামনে খাড়া হওয়ার ভয় করেছিল এবং নাফসকে অসৎ কামনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল, বেহেশতই হবে তার ঠিকানা।"

নাফস শব্দের অর্থ আগেই লিখেছি 'প্রবৃত্তি'। এ আয়াতে هَوٰى শব্দটির অর্থ কুপ্রবৃত্তি।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, বেহেশত পেতে হলে নাফসের দাবিকে অগ্রাহ্য করতে হবে। প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। ঈমানের উদ্দেশ্য তো বেহেশতে যাওয়াই। যদি নাফস নামক তাগূতকে মানতে অস্বীকার করা না হয় তাহলে বেহেশত পাওয়া যাবে না।

www.priyoboi.com

শয়তান তো অবশ্যই তাগূত। সে সব সময় আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য কুমন্ত্রণা দেয়। কিন্তু সে মানুষকে জোর করে নাফরমানি করাতে পারে না। সে মানুষের নাফসকে তার অনুগত বা বাধ্য করে। তাই শয়তানকে নাফস থেকে আলাদা কোনো শক্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না। এ কারণেই প্রথম নম্বর তাগূত হিসেবে নাফসের সাথেই শয়তানকে গণ্য করা উচিত। যারা তাগূত শব্দের অর্থ শয়তান লিখেছেন তারা তাগূতের মর্ম বুঝেননি।

২. সামাজিক কুপ্রথা

ইসলামবিরোধী বা শরীআতের সীমার বাইরে যত রীতিনীতি ও প্রথা সমাজে চালু রয়েছে, এসবকে তো কুপ্রথাই বলতে হয়। আইনের চেয়েও এদের শক্তি অনেক বেশি। আইন প্রয়োগ করার জন্য সরকারি শক্তির প্রয়োজন হয়; কিন্তু সামাজিক কুপ্রথা নিজের শক্তিতেই চালু থাকে। এমনকি আইন করেও কুপ্রথা বন্ধ করা যায় না। যেমন যৌতুক প্রথা। যৌতুকবিরোধী কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও এ কুপ্রথা বেড়েই চলেছে। আলেমসমাজের জোরদার ওয়ায-নসীহত সত্ত্বেও মাযারপূজার জৌলুশ কমছে না। বিয়ে-শাদিতে তো কুপ্রথার কোনো সীমাই নেই।

এসব কুপ্রথা বিরাট তাগূতি শক্তি। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কুপ্রথা হুকুম চালিয়েই যাচ্ছে। এসবকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত না থাকলে ঈমান আনা সত্ত্বেও আল্লাহর নাফরমানি চলতেই থাকবে।

সূরা বাকারার ১৭০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ـ

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যেসব হুকুম নাযিল করেছেন তা পালন কর, তখন তারা বলে, আমরা তো তা-ই করব, যা আমাদের বাপ-দাদাকে করতে দেখেছি।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগেই যদি কুপ্রথাকে অমান্য করার ফায়সালা না করা হয় তাহলে ঈমান আনা সত্ত্বেও এ তাগূতি শক্তিকে মেনে চলতে থাকবে।

৩. শাসনশক্তি

আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুম করার সুযোগ তো শাসনশক্তির হাতেই সবচেয়ে বেশি। তাই এটা অত্যন্ত শক্তিমান তাগূত। ফিরাউন ও নমরূদ শাসনশক্তির দাপটেই তো মানুষকে আল্লাহর বদলে তাদের দাস বানাত। তাই ঈমান আনার আগেই যদি এ বিষয়ে চেতনা না থাকে যে, আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম যেখান থেকেই আসুক তা অমান্য করে আল্লাহর দাস হিসেবেই জীবন যাপন করব, তাহলে ঈমান আনা সত্ত্বেও শাসনশক্তির যুলুমের ভয়ে আল্লাহর দাসত্ব বাদ দিয়ে শাসনশক্তির দাসত্বই করবে।

শাসনশক্তি মানে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতাই নয়। মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্বকেই শাসনশক্তি মনে করতে হবে। স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব করার সুযোগ আছে। পিতামাতা সন্তানের শাসক। কর্মকর্তা কর্মচারীর উপর শাসক। শাসনক্ষমতা যেখানেই আছে তা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম চালাতে পারে। তাই ঈমান আনার আগেই সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম যেখান থেকেই আসুক তা কিছুতেই মানা যাবে না।

৪. রিয্ক বন্ধ করে দেওয়ার ভয় দেখানোর শক্তি

এ তাগূতি শক্তিটিকে শাসনশক্তির মধ্যেও গণ্য করা যায়; কিন্তু এটাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, শাসনশক্তির পক্ষ থেকে অন্য যত রকম শাস্তির ভয় দেখিয়ে অন্যায় হুকুমের গোলাম বানানো যাক না কেন, চাকরি থেকে বরখাস্ত করে রিয্ক বন্ধ করার ভয় দেখানোর শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি মারাত্মক।

মসজিদের ইমাম, মাদরাসা-স্কুল-কলেজের শিক্ষক, কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী যে কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকরি করে, ঐ কর্তৃপক্ষ ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ভয় দেখিয়ে ইকামাতে দীনের ফরয দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারে। রিয্কের আসল মালিক আল্লাহ, এ কথা জানা সত্ত্বেও চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কায় সহজেই দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

www.priyoboi.com

তাই ঈমান আনার আগে এ কঠোর তাগূতি শক্তি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও মন দুর্বল না হয়। পূর্বসাবধানতা ছাড়া এত বড় বিপদে স্থির থাকা সম্ভব নয়।

৫. অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তি

কতক মহল এমন আছে, যেখানে কোনো ব্যক্তি অধীনদের কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য দাবি করে থাকে। যেহেতু তিনি বলেছেন, তাই তা মেনে চলতে হবে। যত অযৌক্তিকই হোক, তার ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে। তার সাথে বিতর্কের কোনো অধিকার কারো নেই। তার নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে। এমন অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তিও তাগূত।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (স) ছাড়া অন্য কেউ নির্ভুল নয়। তাই এ দুজনের আনুগত্য অন্ধভাবেই করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কারোই অন্ধ আনুগত্য দাবি করার অধিকার নেই। কিন্তু এমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা থাকতে পারে, যাদেরকে তাদের ভক্তরা অন্ধভাবে আনুগত্য করে এবং তারাও এ জাতীয় আনুগত্য দাবি করে।

সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ওলামা ও দরবেশদেরকে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে।

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হলেও তাদের কতক আলেম ও পীরকে অন্ধভাবে মেনে চলে। তারা এমন অন্ধ আনুগত্য দাবি করে বলেই এভাবে তারা তাদেরকে মানে। তাই ঈমান আনার আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূল (স) ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে অন্ধভাবে মেনে চলবে না।

যত রকম শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও সত্তা তাগূত হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য সেসবই উপরিউক্ত পাঁচটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই পাঁচটি তাগূত নয়, পাঁচ প্রকার তাগূতি শক্তি রয়েছে, যেগুলোর কাফির হওয়ার পূর্বে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো তাগূতের নিকট পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

'উরওয়াতুল উসকা' মানে কী?

প্রথমে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, তাগূতের কাফির হয়ে যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয় তাহলে এমন মযবুত রজ্জু ধরা হয়, যা কখনো ছিঁড়বে না। আয়াতে اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى বলা হয়েছে, যার অর্থ মযবুত রশি বা হাতল। এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

সকল তাগূতি শক্তিকে অস্বীকার ও অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক অত্যন্ত মযবুত হয়। ঐ সম্পর্কের কথা আল্লাহ তাআলা নিজেই কুরআনের সর্বশেষ সূরায় জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা নাস-এ মানুষের সাথে আল্লাহর তিন রকম সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে ঈমান আনে আল্লাহ তার রব, বাদশাহ ও ইলাহ।

তাগূতের প্রতি কুফরী করার পর আল্লাহর প্রতি যে ঈমান আনে, তার সাথে আল্লাহর ঐ তিন রকম সম্পর্ক কায়েম হয়। এ সম্পর্ক এত মযবুত হয় যে, তা কখনো ছিন্ন হয় না। কিন্তু যদি ঈমান আনার পূর্বে তাগূতের কাফির না হয় তাহলে মানসিক দিক দিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাগূতের চাপে পড়ে যখন আল্লাহর নাফরমানি করে তখন ঐ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে ঐ তিনটি সম্পর্কের আলোচনা করা হলে বিষয়টা উপলব্ধি করা সহজ হতে পারে।

আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্কের ধরন

১. রব হিসেবে সম্পর্ক

রব মানে প্রতিপালক, লালন-পালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী। মায়ের পেটে আমি যখন ভ্রূণ অবস্থায় ছিলাম তখন থেকে এখন পর্যন্ত যিনি আমাকে গড়ে তুলে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনিই আমার রব। মায়ের পেটে আমার দেহ যিনি গড়েছেন, জন্মের সাথে সাথে যিনি মায়ের বুকে আমার খাবার দিয়েছেন, আমার হৃৎপিণ্ডকে যিনি সচল রেখেছেন, প্রতি মুহূর্তে যিনি আমার নিঃশ্বাস জারি রেখেছেন,

www.priyoboi.com

তিনিই আমার রব। তাঁকে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব? তিনি রাব্বুল আলামীন হওয়া সত্ত্বেও নামাযে তাঁকে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' ও 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' জপ করার মাধ্যমে 'আমার রব' হিসেবে আমার অতি আপন বলে অনুভব করতে শেখানো হয়েছে। আমার চেতনায় তাঁকে যেন স্থায়ীভাবে উপস্থিত মনে করি।

২. বাদশাহ হিসেবে সম্পর্ক

আল্লাহ আমার বাদশাহ। আর আমি তাঁর প্রজা। তাঁরই রাজত্বে আমি বাস করি। এখান থেকে কোথাও যাওয়ার সাধ্যও আমার নেই। আমি চাই সুখ-শান্তি। আমার বাদশাহ যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবেই আমি সুখে থাকতে পারব। তাই আমার এমন কিছুই করা উচিত নয়, যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

৩. তিনি আমার ইলাহ

'ইলাহ' শব্দের প্রতিশব্দ মা'বুদ। আবদ মানে দাস। আর মা'বুদ মানে যার দাসত্ব করা হয় বা যিনি মনিব। মনিব হুকুমকারী আর দাস হুকুম পালনকারী। সে হিসেবে ইলাহ মানে হুকুমকর্তা। এক শব্দে ইলাহ-এর অর্থ করা যায় না। তবে হুকুমকর্তা বললে মোটামুটি ভাব প্রকাশ পায়।

শুধু হুকুমকর্তা বলা যথেষ্ট নয়। কারণ, মানুষের মধ্যেও অনেকে আমার-আপনার হুকুমকর্তা আছেন। পিতামাতা, সরকার, কর্মকর্তাও হুকুম করেন। তাই ইলাহ মানে 'হুকুমকর্তা প্রভু'। অন্য কোনো হুকুমকর্তা প্রভু নয়। এটুকুও যথেষ্ট নয়। ইলাহ শব্দের সঠিক অর্থ হয় 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু'। আমার ইলাহ-এর হুকুমের বিরোধী হুকুম করলে আমি পিতার হুকুমও মানি না। তিনি পিতার হুকুম মানতে বলেছেন; কিন্তু তাঁর হুকুমের খেলাফ হলে মানতে নিষেধও করেছেন। তাই আমি শুধু একজনের হুকুমই মানি। তাঁর হুকুমেই পিতার হুকুম মানি। তাই আল্লাহ আমার 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু'।

তাগূতের হুকুম মানলে এসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়

আল্লাহর হুকুমের বিরোধী যেসব হুকুম তাগূতের পক্ষ থেকে আসে তা পালন করলে আল্লাহর সাথে ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কেউ যদি নাফসের দাস হয় তাহলে সে আল্লাহর দাস হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

ঈমান আনার সময়েই এ বিষয়ে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আল্লাহর মর্জি, ইচ্ছা ও হুকুমের বিরোধী যত বড় শক্তিই হোক, এমন কোনো তাগূতকে কোনো অবস্থায়ই মেনে নেব না। একমাত্র প্রভু হিসেবে যাঁর নিকট আশ্রয় নিয়েছি তিনিই আমার একমাত্র রব, বাদশাহ ও ইলাহ। তিনিই সর্বাবস্থায় আমার জন্য যথেষ্ট। হাসবুনাল্লাহ।

আল্লাহর সাথে এসব সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন থাকলে তিনি মুমিনের অন্তরে এমন দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা, সাহস ও ধৈর্য দান করেন, যার ফলে কোনো তাগূতি শক্তিই তাঁকে দুর্বল করতে পারে না। এ মানের মুমিন বিপদাপদ, ভয়ভীতি এমনকি মৃত্যুরও পরওয়া করে না; বরং শাহাদাতের জযবায় হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

কালেমায়ে তাইয়েবার বক্তব্য কী?

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটির অর্থ হলো 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই একমাত্র মা'বুদ। 'আল্লাহু ইলাহুন ওয়াহিদ' বলেও এ বক্তব্য পেশ করা যায়; কিন্তু এ ভাষায় না বলে 'লা' শব্দ দিয়ে কেন শুরু করা হলো?

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এখানে 'লা' বা 'না' শব্দ দ্বারা সকল তাগূতি শক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রথমে তাগূতকে অস্বীকার না করলে আল্লাহকে সত্যিকারভাবে একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

প্রথমে কুরআনের যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে এর দাবি তখনই পূরণ হয়, যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা হয়। অন্য কোনোভাবেই ঐ দাবি পূরণ হতে পারে না।

একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক। কেউ যদি ধানের ফসল বুনতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে জমি থেকে সকল আগাছা দূর করতে হবে। আগাছা রেখেই যদি ধানের বীজ ফেলা হয়, তাহলে ফসল হওয়া দূরের কথা, বীজের ধানও নষ্ট করা হলো।

মানুষের মনের জমিও তাগূতের আগাছায় ছেয়ে আছে। নাফস, কুপ্রথা ইত্যাদি মনের জমি দখল করে আছে। এসবকে উৎখাত না

www.priyoboi.com

করে ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে স্থাপন করা সম্ভবই নয়। তাই আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে ঘোষণা করার আগেই 'লা' বলে তাগূতকে উৎখাত করতে হবে। তাগূতি শক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে উৎখাত করা সম্ভব নয়।

কালেমা তাইয়েবা এমন কোনো মন্ত্র নয় যে, মুখে তা উচ্চারণ করলেই বেহেশত যাওয়া যাবে। এ শব্দগুলো কালেমা নয়, এর অর্থ ও বক্তব্যই আসল কালেমা।

কালেমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণ করার সাথে সাথে এর মর্মকথা বুঝতে হবে। তা না হলে শুধু উচ্চারণ করলেই মুমিন হবে না। ময়না বা টিয়া পাখিকে শেখালে কালেমা উচ্চারণ করতে পারবে; কিন্তু যেহেতু এর মর্মকথা বোঝার সাধ্য পাখির নেই; তাই পাখি মুমিন বলে গণ্য হবে না।

আসলে কালেমায়ে তাইয়েবা হলো জীবনের নীতি-নির্ধারণী ঘোষণা (Life Policy Declaration)। যে ব্যক্তি কালেমা উচ্চারণ করল সে এর দ্বারা ঘোষণা করল যে, সে তার জীবন কোন্ নীতি অনুযায়ী যাপন করবে। এর দুটো দফা রয়েছে– ১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

প্রথম দফায় ঘোষণা করা হয় যে, আমি আমার গোটা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সব সময়ে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব। এর বিরোধী কোনো হুকুম মানব না।

দ্বিতীয় দফায় ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহর হুকুম যে রাসূল (স)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে এবং তিনি যেভাবে যে তরীকায় যে হুকুম পালন করেছেন, আমি একমাত্র ঐ নিয়মেই সেগুলো পালন করব; অন্য কোনো তরীকা গ্রহণ করব না।

এ দুদফা পলিসি অনুযায়ী যে মুমিন জীবন যাপন করবে তার সকল কাজ-কর্মই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এমন মুমিনের জীবনে দীনদারি ও দুনিয়াদারিতে কোনো পার্থক্য নেই। যেসব কাজকে দুনিয়াদারি মনে করা হয় তাও যদি আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী করা হয় তাহলে তা দীনদারি হিসেবেই গণ্য হবে।

কুরআন মাজীদের সূরা নাহ্লের ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوْتَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাক।

তাগূতকে না চেনার পরিণাম

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা কাফির ছিলেন এবং নূহ (আ)-এর এক ছেলে কাফির ছিল। মুসলমানের ঘরে পয়দা হলে আপনা-আপনিই মুসলিম হয়ে যায় না। পিতা-মাতা যদি সন্তানকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তাহলে আশা করা যায়, সে ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে মুসলিমের গুণাবলি অর্জন করবে। ডাক্তারের সন্তান ডাক্তারি বিদ্যা না শিখলে যেমন ডাক্তার হিসেবে গণ্য হয় না, মুসলিমের সন্তানও মুসলিমের গুণাবলি অর্জন না করলে আল্লাহর নিকট মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

সত্যিকার মুমিন হতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাগূতকে চিনতে হবে, যাতে ঈমান আনার সময়ই তাগূতকে অস্বীকার করতে পারে এবং যখনই তাগূতের সম্মুখীন হয় তখনই দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

যারা দীনকে শেখার চেষ্টা করে না, নামায-রোযার ধার ধারে না তাদের কথা বাদ দিলাম। যারা সমাজে দীনদার ও ধার্মিক হিসেবে পরিচিত, তাদের মাঝেও অনেককে ঈমানের দিক দিয়ে বাস্তব জীবনে যথেষ্ট দুর্বল দেখা যায়। তাগূতি শক্তির চাপে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে তারা সক্ষম হয় না।

এর কারণ তালাশ করলে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, তাগূত সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা নেই এবং তাগূতের কাফির না হলে যে ঈমান মযবুতই হতে পারে না সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান নেই।

রাসূল (স) দীনের ইলম তালাশ করা ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। সহীহ ইলম না থাকায় দীনদার লোকও তাগূতের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়।

সমাপ্ত

www.priyoboi.com